নীল বাঘ

হর্হে লুই বার্হেস / (ভাষান্তর : মৌসুমী মুখোপাধ্যায়)

ব্লেক তাঁর এক বিখ্যাত কবিতায় বাঘকে এঁকেছেন আগুনের মত উজ্জ্বল করে, শয়তানের চিরকালীন ছাঁচে ঢেলে। চেস্টারটনের সেই বিখ্যাত উক্তিটা আমার বেশ পছন্দ, সেখানে বাঘকে ভয়ঙ্কর সৌন্দর্যের এক প্রতীক বলে দেখানো হয়েছে। এগুলো বাদ দিলে আর কোনো কথাতেই সেই জাদুটা নেই যা দিয়ে বাঘের ব্যাখ্যান হয়। সেই বাঘ, যার আদল কিনা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানুষের কল্পনায় বেঁচে আছে। বাঘ চিরকালই আমায় টেনেছে। মনে পড়ে ছোটো বেলায় চিড়িয়াখানায় একটা বিশেষ খাঁচার সামনেই আমি আটকে থাকতাম, অন্য গুলোকে নিয়ে আমার কোনো আগ্রহ ছিল না। এনসাইক্লোপিডিয়া আর প্রকৃতিচর্চার বই গুলোকে আমি বাঘের ছবি কেমন ছেপেছে তাই দিয়ে বিচার করতাম। তারপর যখন 'জাঙ্গল বুকস' পড়তে পেলাম তখন দেখি, আছে ছ্যা: সেখানে বাঘ-চরিত্র শের খাঁ কিনা নায়কের শত্রু। তারপর অনেকগুলো বছর চলে গেলেও এই অদ্ভুত আর্কষণ কিন্তু আমায় কোনো দিনই ছেড়ে গেল না। জীবনের ছোটোবড় সব ওঠানামা, মনের মধ্যে শিকারী হবার স্ববিরোধী বাসনা, এসব কাটিয়েও সে আকর্ষণ দিব্যি বেঁচে রইল। এই সে দিন অব্দিও (মনে হবে অনেকদিনের কিন্তু আসলে তা নয়) লাহোর ইউনিভারসিটির দশটা পাঁচটার জীবনের সঙ্গে এর কোনোও গণ্ডগোলই ছিল না। এমনিতে পড়াতাম প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য তর্কবিদ্যা আর রোবারাগুলো তোলা থাক স্পিনেজার দর্শনের ওপর সেমিনারের জন্য। একটা কথা বলা উচিত আমি স্কটল্যান্ডের লোক হয়ত বাঘেদের প্রতি আমার ওই টানই আমাকে অ্যাবারডিন থেকে পাঞ্জাব পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেছে। আমাদের বাইরের জীবন যা ছিল সাধারণ একজন মানুনের মতই, কিন্তু স্বপ্নে আমি সবসময়েই বাঘেদের দেখতাম। আজকাল অবশ্য খালি অন্য সব জিনিস দেখি।

ঘটনাগুলো আমি সবিস্তারে একাধিকবার স্মরণ করেছি, এই সেদিনও মনে হত অন্য কারোর জীবনের ঘটনা। তবু আমি সেগুলোকে টেনেটুনে খাড়া করেছি, কারণ আমার বিবরণের মধ্যে তো ও গুলোকে লাগবেই।

১৯০৪ -এর শেষাশেষি আমি এক জায়গায় পড়লাম, গঙ্গার বদ্বীপ অঞ্চলে একটা নীল জাতের বাঘের খোঁজ পাওয়া গেছে, খবরটা পরবর্ত্তী কয়েকটা টেলিগ্রামে পাকা হল। কিছু অসঙ্গতি আর গরমিল ছিল, তবে এরকম ক্ষেত্রে সে তো একটু থাকবেই। আরো একবার আমার পুরোনো প্রেম জেগে উঠল। তবে তা সত্ত্বেও এর মধ্যে কিছু ভুলভ্রান্তি আছে বলে সন্দেহ হল, কারণ রঙের নাম হচ্ছে এক ভয়ঙ্কর ঘোলাটে ব্যাপার, সবাই জানে, মনে আছে, একবার পড়েছিলাম আইসল্যান্ডিক ভাষায় ইথিওপিয়া হল 'ব্লাল্যান্ড', মানে নীল দেশ, মানে কালো মানুষদের দেশ। কাজেই, হতেই পারে এই নীল রঙের বাঘ হচ্ছে আসলে কালো চিতা বাঘ। গায়ে ডোরা দাগ ছিল কিনা সে নিয়ে কোনো উল্লেখ ছিল না। লন্ডন প্রেস থেকে ছাপা ছবিতে দেখা যাচ্ছে একটা নীল বাঘ, তার গায়ে রুপোলি ডোরা। বোঝাই যাচ্ছে বুজরুকি। ছবির নীলটাও সেরকম, যত না বাস্তব তার চেয়ে বেশী জমকালো। একবার একটা স্বপ্নে এমন এক নীল বাঘ দেখেছিলাম সেরকম নীল আগে কখনও দেখিনি, এবং সেটা প্রকাশ করার জন্য কোনো শব্দও খুঁজে পাইনি। ঠিক যে পরতটা দেখেছি তার কথা কিছুই বোঝানো যায় না।

ক'মাস পর আমার এক সহকর্মী আমাকে বললেন গঙ্গা থেকে মাইল কয়েক দূরের একটা গ্রামে নীল বাঘেদের নিয়ে কিছু কথাবার্তা তিনি শুনেছেন। ওই খবরটাতে অবাক হলাম, কেননা ওই অঞ্চলে বাঘেরা দুর্লভ। আরো একবার আমি নীল বাঘের স্বপ্ন দেখলাম, বালির ওপর দিয়ে যেতে সে তার লম্বা ছায়া প্রক্ষেপ করছে। তখন ইউনিভারসিটির একটা টার্ম শেষ হয়েছে, আমি সেই সুযোগটা নিলাম ওই গ্রামে যাওয়ার জন্য। গ্রামের নামটা আমি আর মনে করতে চাই না (কেন চাই না সেটা শিগগিরই বোঝা যাবে)।

বর্ষার শেষের দিকে আমি পৌঁছোলাম। গাঢ় বাদামী রঙের জঙ্গল দিয়ে ঘেরা গ্রামটা একটা পাহাড়ের পায়ের কাছে আতঙ্কে জবুথবু হয়ে বসে আছে, সে পাহাড় দেখি যত না উঁচু তার চেয়ে বেশি চওড়া, কিপলিং - এর লেখায় পুরো ভারত, পুরো পৃথিবীটাই কোনও না কোনওভাবে পাওয়া যায়, কাজেই আমার এই অভিযানের গ্রামটার কথা তো থাকবেই।' তার পরিস্থিতি বোঝানোর জন্য একটি সংবাদই যথেষ্ট, গাঁয়ের কুঁড়েগুলো নিরাপত্তা বলতে খালি একটা খাঁড়ি আর গোটাকয় দোদুল্যমান বেতের সাঁকো। দক্ষিণের দিকে জলা, ধানক্ষেত আর ঘোলাটে জলের নদীওলা একটা খাত। নদীটার নাম আমার কোনোদিনই জানা হয়নি। আর সেটা ছাড়িয়ে, আবারও জঙ্গল।

গ্রামে যারা বাস করে তারা সবাই হিন্দু। ব্যাপারটা আমার পছন্দ না, যদিও আমি আগে থেকেই জানতাম যে তাই হবে। আমি সবসময় মুসলিমদের মধ্যেই ভালো থাকি। যদিও জানি, ইহুদি ধর্ম থেকে যতগুলো ধর্ম এসেছে তার মধ্যে ইসলাম সবচেয়ে বাজে।

আমরা জানতাম, ভারত দেশটা মানবতায় ভরপুর। গ্রামটাতে এসে হল ভারত জঙ্গলে ভরপুর কুঁড়োগুলোতে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকলাম। দিনগুলো তো দমবন্ধ করা, আর রাতগুলোতে একফোঁটা নিস্তার নেই।

পৌঁছোনো মাত্র গ্রামের বয়োবৃদ্ধরা শুভেচ্ছা জানালো, তাদের সঙ্গে আমি ধরি মাছ না, ছুঁই পানি করে আবছা ভদ্রগোছের কথাবার্তা চালিয়ে গেলাম। জায়গাটা যে কত গরিব সে কথা তো আগেই বলেছি, কিন্তু এও জানি যে প্রত্যেক মানুষ বিশ্বাস করে যে তার একান্ত নিজের জায়গা, যার সাথে তার নাড়ির টান, তার মধ্যে এমন একটা অসাধারণ ব্যাপার আছে যা আর কোথাও নেই। এ বিশ্বাস এক স্বতঃসিদ্ধের মত। কাজেই আমি ওই সন্দেহজনক বাসস্থান এবং আমাকে পরিবেশন করা একইরকম সন্দেহজনক রান্নাবান্না গুলোকে বেশ রংদার ভাষায় প্রশংসা করলাম। আর ঘোষণা করলাম যে ওই অঞ্চলে খ্যাতি একেবারে লাহোর অব্দি পৌঁছে গেছে। বলেই দেখি মানুষগুলোর মুখের ভাব কেমন বদলে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই বুঝলাম একটা কোনো কেলেঙ্কারি করে ফেলেছি, আমার দুংখ প্রকাশ করা উচিত। এই লোকগুলোর কোনো গোপন ব্যাপার আছে, সেটা ওরা অচেনা

লোকের কাছে বলবে না। হয়ত ওই নীল বাঘটাকে পুজো করে, হয়ত ওদের গোষ্ঠীর নিজস্ব কোনো ধর্মীয় বিশ্বাস - রীতি - নীতি আছে, যা আমার বেমক্কা কথাবার্তায় কলুষিত হয়েছে।

পরদিন সকাল অব্দি অপেক্ষা করলাম। যখন ভাত খাওয়া হয়ে গেল আর চাও গলা দিয়ে নেমে গেলে, তখন আমি আমার কথাটা পাড়লাম। আগের রাতে তো একটু অভিজ্ঞতা হয়েছে, তবু কথাটা বলার পরে কি যে হল কিছুই বুঝলাম না— মানে বুঝে পারলাম না। পুরো গ্রামটা আমার দিকে হতভম্ব হয়ে প্রায় অতঙ্কের চোখে চেয়ে আছে। কিন্তু যখন আমি তাদের বললাম যে আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে ওই অদ্ভুত চামড়াওলা জীবটাকে ধরা, মনে হল আমার কথায় তারা অনেকটা স্বস্তি পেল। ওদের একজন বলল, জঙ্গলের ধারে জন্তুটাকে সে দেখেছে।

মাঝরাতে ওরা আমায় ডেকে তুলল। একটা বাচ্চা ছেলে আমায় বলল যে খোঁয়াড় থেকে একটা ছাগল পালিয়েছিল, সেটাকে খুঁজতে গিয়ে ও নদীর অন্য পারে নীল বাঘটাকে দেখেছে। আমার মাথায় চিন্তা খেলে গেলো, শুক্লপক্ষের প্রথম দিককার স্বল্প আলোয় তার পক্ষে রংটা বুঝতে পারা কোনোমতেই সম্ভব নয়, কিন্তু প্রত্যেকে গল্পটাকে বেশ জোরের সঙ্গে সায় দিল। ওদেরই একজন এতক্ষণ চুপ করেছিল, এবার সেও বলল যে সেও ওটা দেখেছে। রাইফেল সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে যেন দেখলাম, কিম্বা সবটাই আমার কল্পনা, একটা বেড়ালের মতন আদলওয়ালা ছায়া জঙ্গলের ছায়ার মধ্যে গুটি সুটি মেরে সটকে পড়ল। ছাগলটাকে ওরা আর খুঁজে পেল না। কিন্তু যে জন্তুটা ওটাকে টেনে নিয়ে গেছে সেটা আমার নীল বাঘ হতেও পারে, নাও হতে পারে। তারা রীতিমতো জোরের সঙ্গে আমার আরোও সব নানা চিহ্ন দেখাতে লাগল— তার কোনোটা দিয়েই কিছু প্রমাণ হয়না।

কয়েকটা রাতের পর আমি বুঝতে পারলাম, বাঘ এসেছে বলে এইসব মিথ্যে হাঁকডাকগুলো বেশ একটা রুটিনমাফিকই করা হচ্ছে। এ গাঁয়ের লোকগুলো, সব ডানিয়েল ডিফোর মত, বানিয়ে বানিয়ে পরিস্থিতির সবিস্থার নিখুঁত বর্ণনা দিতে ওস্তাদ ওরা সব সময়েই বাঘ দেখছে, এই দেখল দক্ষিণের ধানক্ষেতে তো ওই দেখল সেই উত্তরের জঙ্গলে। তবে এটা টের পেতে আমার দেরী হল না। গাঁয়ের মানুষগুলো যেভাবে একজনের পর আর একজন বাঘ দেখতে পাচ্ছে, তার মধ্যে একটা সন্দেহজনক ছন্দ আছে। যেখানে বাঘের দেখা পাওয়া যাচ্ছে আমার হাজির হওয়া আর বাঘের চম্পট দেওয়া, এ দুটো মুহূর্ত সবসময়ই বড্ড নিখুঁতভাবে মিলে যাচ্ছে। সবসময়ই আমাকে দেখানো হচ্ছে একটা পায়ের ছাপ, একটা থাবার চিহ্ন, কটা ভাঙা ডালপালা, কিন্তু মানুষের হাতে মুঠো দিয়েও ওরকম বাঘের থাবার ছাপ তৈরী করা যায়, একবার কি দুবার কুকুরের মৃতদেহ দেখলাম। এক চাঁদনী রাতে আমরা ভোর অব্দি একটা ছাগলকে টোপ বানিয়ে লুকিয়ে বসে রইলাম, সব বৃথা। প্রথমে আমি ভেবেছিলাম যে ঐ দৈনন্দিন রূপকথার আসল মানেটা হোলো আমার থাকার সময়টাকে আরো বাড়ানোর জন্য উৎসাহ দেওয়া, কেননা এতে গ্রামের উপকার হবে— লোকগুলো আমাকে খাবার বিক্রি করত, আমার ঘরের টুকীটাকি কাজও করে দিত। আমার ধারণাটা ঠিক কিনা সেটা পরীক্ষা করার জন্য ওদের আমি বললাম যে আমি চলে যাওয়ার চিন্তাভাবনা করছি অন্য কোন অঞ্চলে, ভাঁটির দিকে, বাঘের খোঁজে। অবাক হয়ে দেখলাম, আমার সিদ্ধান্তে ওরা কিন্তু খুশী। তবে একটা গোপন ব্যাপার যে আছে, এবং সবাই যে আমাকে চোখে চোখে রাখছে, এ অনুভূতি রয়েই গেল।

আগেই বলেছি, যে জংলা পাহাড়টার পায়ের কাছে গ্রামটা যেমন তেমন ভাবে গড়ে উঠেছে খানিকটা মালভূমি ধরনের। পাহাড়ে অন্যদিকে, পশ্চিমও উত্তরের দিকটায়, জঙ্গলটা আবার শুরু হয়েছে। যেহেতু পাহাড়ের ঢালটা এবড়ো খেবড়ো নয়, একদিন বিকেলে প্রস্তাব দিলাম সবাই মিলে এর ওপরটায় উঠি। আমার এই সাধারণ কথাতেই যেন গ্রামে মানুষগুলো আতঙ্কে অবসন্ন হয়ে পড়ল। একজন চিৎকার করে উঠল, পাহাড়ের ধারটা নাকি সাংঘাতিক খাড়া। ওদের মধ্যে সবচেয়ে, বয়স্ক যে, সে খুব গম্ভীর ভাবে বলল, আমার লক্ষে পৌঁছোনো অসম্ভব, কারণ চুড়াটা পবিত্র, মানুষকে ওপরে উঠতে না দেওয়ার জন্যে ওখানে তুকতাক আছে। নশ্বর পা দিয়ে যে ওই চূড়ায় উঠবে, অলৌকিক মহিমা দেখে ফেলার ঝুঁকি আছে, তাতে অন্ধ বা পাগল হয়ে যাবার ভয়।

তর্ক করলাম না আমি, কিন্তু রাতে সবাই ঘুমিয়ে পড়ার পরে, নিঃশব্দে আমার কুঁড়ের বাইরে এসে পাহাড়ের সহজ ঢাল বেয়ে ওপরে উঠতে লাগলাম।

পথ বলে কিছু নেই, লতাগুল্মের ঝোপঝাড় আমায় বাধা দিতে লাগল। তখন দিগন্তে সবে চাঁদ ঢলেছে। প্রত্যেকটা জিনিস নজর করতে লাগলাম অখণ্ড মনোযোগে, কারণ আমার মন বলছিল আজকের দিনটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে, হয়তো সারা জীবনের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আজও মনে পড়ে গাছের পাতা আর ঝোপ ঝাড়ের সেই অন্ধকার আবছায়া, নিকষ কালো বলেই হয়। তখন ভোর আর দূরে নয়, আকাশও আস্তে আস্তে ফ্যাকাসে হতে শুরু করেছে, কিন্তু সমস্ত জঙ্গল জুড়ে একটা পাখি ডেকে উঠলো না।

কুড়ি তিরিশ মিনিট এভাবে ওঠার পর আমি চূড়ায় পৌঁছোলাম। কল্পনা করতে কষ্ট হল না, যে নীচে গ্রামটা একেবারে সাংঘাতিক গরমে হাঁসফাঁস করছে। এ জায়গা তার চেয়ে ঠাণ্ডা। ঠিকই ভেবেছিলাম, এটা কোনো চূড়া নয়, বরং যেন একধরনের উঁচু চাতাল বা ধাপ, খুব একটা বড় নয়। আর জঙ্গলটা যেন পাহাড়ের চাপরাশ জুড়ে গুড়ি মেরে উঠে এসে একে ঘিরে ধরেছে। মনে হল যে আমি মুক্তি পেলাম, যেহেতু গ্রামের মধ্যে আমার বাসস্থানটা হয়ে উঠেছিল একটা জেলখানা। ওখানকার মানুষগুলো যে আমায় বোকা বানাবার চেষ্টা করেছিল, সেটা আমি পাত্তাই দিলাম না। মনে মনে ভাবলাম, লোকগুলো ছেলেমানুষ গোছের।

আর ব্যাপারটা...ওটাকে দেখতে পাবো এই বিশ্বাস আর কৌতুহল একটানা হতাশার চোটে মরেই গিয়ছিল, তবু আমি যন্ত্রের মত বাঘের চলা ফেরার চিহ্ন খুঁজে চললাম।

জমিটা ফাটল আর বালিতে ভর্তি। একটা ফাটলের মধ্যে— সেটা তেমন গভীর নয়, তার থেকে আবার শাখাপ্রশাখাও ছড়িয়েছে— একটা রঙের আভাসে চোখ আটকে গেল। অবিশ্বাস্য ! স্বপ্নের বাঘের সে রঙ দেখেছি, এ ঠিক রং, ওতে কোনোদিন চোখ না পড়লেই বোধ হয় ভালো ছিল। কাছে গিয়ে দেখলাম। সরু ফাটলটা ছোটো ছোটা পাথরে ভর্তি, সবগুলো একই রকম,

বৃত্তাকার, ব্যাসটা মাত্র কয়েক সেন্টিমিটার হবে আর খুব মসৃণ এমন নিয়মিত ছাঁদে, দেখলে মনে হয় বানানো জিনিস, যেন কোনও মুদ্রা বা বোতাম কিম্বা খেলার খুঁটি।

নিচু হয়ে ফাটলটার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে কতগুলো পাথর বের করে আনছি, কেমন একটা আলতো কাঁপুনি টের পেলাম, মুঠো ভর্তি ছোটো ছোটো পাথর গুলোকে আমার জ্যাকেটের ডান পকেটে রাখলাম যেখানে একটা ছোটো কাঁচি আর এলাহাবাদ থেকে আসা একটি চিঠি ছিল। আমার গল্পে ওই আকস্মিক দুটো বস্তুর একটা ভূমিকা আছে।

কুঁড়েতে ফিরে আমি জ্যাকেটটা খুলে রেখে শুয়ে পড়লাম, আবারও বাঘের স্বপ্ন। স্বপ্নে আমি ওটার রঙটা ভালো করে খেয়াল করলাম। এ হল সেই বাঘের রঙ, আবার উঁচু চাতালে পাওয়া সেই ছোটো ছোটো পাথরগুলোর রঙ। পরদিন সকালে বেলা বাইতেই মুখে রোদ পড়ে ঘুম ভেঙে গেল। উঠে পড়লাম পকেট থেকে চাকতিগুলো বার করতে গিয়েই দেখি সহজে বেরোচ্ছে না, সেই কাঁচি আর চিঠিটাও আটকে যাচ্ছে। এক মুঠো বার করলাম, কিন্তু বুঝতে পারলাম আরো দুটো তিনটে ভেতরে রয়ে গেছে। একটা সুড়সুড়ির মত অনুভূতি আর সেই সঙ্গে খুব সূক্ষ্ম এক ধরণের কাঁপুনি মিলে আমার হাতের তালুকে এক নরম উষ্ণতার স্পর্শ দিল। হাতটা যখন আমি খুললাম, দেখি, তিরিশ চল্লিশ খানা চাকতি তার মধ্যে। অথচ হলফ করে বলতে পারি, দশটার বেশি আমি তুলিনি। ওগুলোকে টেবিলের ওপর রেখে পকেট থেকে বাকীগুলোকে বের করতে গেলাম। না গুণেই বুঝলাম, সংখ্যায় অনেক বেড়ে গেছে। সেগুলো ঠেলে ঠুলে জড়ো করে একটা ঢিবি মত বানিয়ে একটা একটা করে গোণবার দিকে চেষ্টা করলাম। ওই সহজ কাজটাই অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালো। ওগুলোর এক একটা স্থির দৃষ্টিতে তাকাই, আমার তর্জনী ও বুড়ো আঙুল দিয়ে সেটাকে চেপে ধরে তুলে নিতে, আর বাদ বাকী গুলোর থেকে আলাদা হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওটা এক থেকে অনেকগুলো হয়ে যায়। পরীক্ষা করে দেখলাম আমার জ্বরটর হচ্ছে কিনা (হয়নি), এবং তারপর আমি ওই একই পরীক্ষা বেশ কয়েকবার পর পর করে গেলাম। জঘন্য সব অলৌকিক কাণ্ডকারখানা ঘটতেই থাকল। মনে হল পায়ের পাতাগুলো ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, পেটের ভেতরটা জমে বরফ হয়ে যাচ্ছে। আমার হাঁটুদুটো কাঁপতে লাগল। জানি না কতটা সময় এভাবেই কেটে গেল।

চাকতি গুলোর দিকে না তাকিয়ে ওগুলোকে এক জায়গায় জড়ো করে জানালা দিয়ে সব ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। একটা অচেনা স্বস্তিবোধের সঙ্গে সঙ্গে আমি টের পেলাম গুলোর সংখ্যা কমেছে, তাতে একটা অদ্ভুত স্বস্তিবোধ হল। দরজাটা বেশ এঁটে বন্ধ করে আমার বিছানায় সুয়ে রইলাম। বিছানার সেই জায়গাটা খুঁজে বার করতে চেষ্টা করলাম ঠিক যেখানটায় আমি আগে শুয়েছিলাম, যাতে করে নিজেকে বোঝাতে পারি যে এই সবটাই ছিল একটা স্বপ্ন। চাকতিগুলোর কথা চিন্তা না করে কোনোভাবে সময়টা কাটিয়ে দেবার জন্যে এথিক্স -এর দশটা সংখ্যা আর সাতটা স্বতঃসিদ্ধ জোরে জোরে আওড়ানো শুরু করলাম, একটু ধীরে যাতে ভুল না হয়। তাতে কাজ হলো কিনা বা মুশকিল।

ভুল তাড়ানোর মত করে এইসব অনুশীলন গুলোর মাঝেই দরজায় একটা আওয়াজ হল। ঝট করে উঠে গিয়ে দরজা খুললাম, ভাবলাম এই রে, একা একা বকবক করছি ওরা শুনে ফেলেছে নিশ্চয়।

খুলে দেখি গ্রামের মোড়ল, ভগবান দাস। তার উপস্থিতি বোধহয় এক মুহূর্তের জন্য আমায় রোজকার বাস্তবে ফিরিয়ে আনল। দুজনে বাইরে বেরোলাম। মনের কোণে কোথাও ছোট্ট একটা আশা ছিল যে চাকতিগুলো এতক্ষণে নিশ্চয়ই মিলিয়ে গেছে, কিন্তু কোথায় কি, ওই তো মাটিতে সব পড়ে আছে। এখন যে সংখ্যায় কটা দাঁড়িয়েছে কে জানে।

বৃদ্ধটি নীচে ওগুলোর দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে তারপর আমার দিকে তাকালো।

''এই পাথরগুলো এখানে নয়, ওই ওখানকার। ওপরের।'' লোকটা বলল, এমনভাবে বলল যেন তার নিজের নয়, অন্য কারোগলায় কথা কইছে।

''হ্যাঁ, সত্যি,'' উত্তরে বললাম আমি। আরো বললাম, ওগুলো আমি ওপরের চাতালটায় পেয়েছি। বলার মধ্যে একটা পাত্তা দিতে না চাওয়ার ব্যাপার ছিল, কিন্তু আবার যেন কাউকে কৈফিয়ৎ দিচ্ছি এই ভাবটাও ছিল, সেটা বুঝেই নিজের মনে একটু লজ্জা পেলাম। ভগবান দাস আমার দিকে নজর না দিয়ে ওই পথেরগুলোর দিকে মোহগ্রস্তের মত চেয়েই রইল। ওগুলো তুলতে বললাম, নড়নচরণ নেই তার। বলতে খারাপ লাগছে, এরপর আমি আমার রিভলবারটা বের করে তাকে আবার আদেশ করলাম, এবার আরেকটু কড়া গলায়।

''বুকে গুলি মারুন সেও ভালো, কিন্তু নীল পাথর হাতে করতে পারব না।'' তোতলাতে তোতলাতে ভগবান দাস বলল।

''ভীতুর ডিম একটা'', বললাম আমি।

আমি জানি আমিও ওর চেয়ে কম ভয় পাইনি, কিন্তু তবু চোখ বন্ধ করে বাঁ হাত দিয়ে এক মুঠো পাথর তুললাম। কোমরের বেল্টে পিস্তলটা গুঁজে, ডান হাতের খোলা তালুতে পাথরগুলো একটা একটা করে ফেলতে লাগলাম। ওগুলোর সংখ্যা বেশ অনেকটা বেড়ে গেল।

ওইসব বাড়া কমা কন নিজের অজ্ঞাতসারেই খানিকটা সরে গেছে, এখন দেখি ওর চেয়ে ভগবান দাসের চিৎকারই আমায় বেশী চমকাচ্ছে।

''এই সেই পাথর যেগুলো নিজে নিজেই জন্মায়!'' লোকটা চিল্লিয়ে উঠল, ''এই এখন অনেকগুলো দেখছেন, কিন্তু পাল্টেও যেতে পারে। আকার পূর্ণিমার চাঁদের মত, আর রঙটা সেইরকম নীল, যে রকম নীল স্বপ্নে ছাড়া দেখা মানা। আমার বাবার বাবা সবাইকে ও গুলোর ক্ষমতার কথা বলেছিল, দেখি ঠিকই বলেছিল।

পুরোগ্রামটা আমদের চারপাশে ভিড় করে এসেছে।

আমার নিজেকে মনে হতে লাগল এক জাদুকর যার দখলে রয়েছে ওইসব অত্যাশ্চর্য বস্তু। সমবেত বিস্ময়ের মাঝখানে আমি চাকতিগুলো উঁচুতে তুলে ধরলাম, ফেলে দিলাম, ছড়িয়ে দিলাম, লক্ষ্য করতে লাগলাম ওগুলো বেড়ে যাচ্ছে, বহুগুণিত হচ্ছে কিম্বা রহস্যময় ভাবে কমে যাচ্ছে। একেবারে গা ঘেঁষাঘেঁসি করে গ্রামবাসীরা দাঁড়িয়ে আছে, বিস্ময় আর আতঙ্কে

স্থানুবৎ। মরদরা তাদের বউদের পীড়াপীড়ি করছে ওই আশ্চর্য ব্যাপারটা দেখার জন্য। একটি মেয়ে অগ্রবাহু দিয়ে তার মুখটা ঢেকে ফেলল, আরেকটা মেয়ে চোখদুটো কুঁচকে শক্ত করে বন্ধ করে রইল। কারো সাহসেই কুলোলো না চাকতি গুলো একবার ছুঁয়ে দেখার— শুধু একটা ছোট্ট ছেলে মনের সুখে ও গুলো নিয়ে খেলাছিল। ঠিক সেই মুহূর্তেই আমার মনে হল যে এই সমস্ত গোলমালে আলৌকিকতা কলুষিত হচ্ছে। যতটা পারলাম সব চাকতিগুলোকে কুড়িয়ে বাড়িয়ে আমার কুঁড়োতে নিয়ে গেলাম।

আমি হয়ত সেদিনের বাদ বাকী অংশটা ভুলে যেতে চেষ্টা করছিলাম। আমার জীবনে যে দুর্ভাগ্যের পরম্পরা আজও চলছে, ওই ছিল তার শুরু। তবে ভুলতে চেষ্টা করি বা নাই করি, ও আর আমার মনে নেই। সন্ধের দিকে আমি আবার ভাবতে শুরু করলাম আগের রাতের কথা। যে অনুভূতি সুখের নয়, কেমন এরকম স্মৃতিকাতরতা। আমার অন্য অনেক কিছুর মত সেই রাতটাকে আর কিছু না থাক, অন্তত বাঘ নিয়ে আমার পাগলামোটাতে ভবপুর ছিল। আমি সেই ছবিগুলো কল্পনা করে সান্ত্বনা পেতে চাইলাম সেগুলো আজ তুচ্ছ, কিন্তু একটা উত্তেজনায় টগবগ করত। আমার নীল বাঘ এখন রোমানদের কালো রাজহাঁসের মতই এক জোলো ব্যাপার, যা পরে পাওয়া গেছিল অস্ট্রেলিয়ায়।

এতক্ষণে যেটা লিখছি সেটা পড়ে দেখি, একটা গোড়ায় গলদ করে বসে আছি। ওই যে ভালো বা খারাপ লেখাপত্তরগুলো যাকে ভুল করে মনস্তত্ব বলা হয়, যেগুলো পড়ার বদভ্যাসের ফলে—কেন জানি না— যা দেখলাম সেগুলোকে মনে করে করে খালি একটা সরলরেখিক কালানুক্রমে সাজানোর চেষ্টা করে চলেছি। সেসব না করে এই চাকতি গুলো যে কি সাংঘাতিক সেই কথাটায় জোর দিলে হত। কেউ যদি আমাকে বলত চাঁদে ইউনিকর্ন আছে, খবরটা আমি মেনে নিতে পারতাম, খারিজ করে দিতে পারতাম, কিম্বা রায় দেওয়াটা মুলতুবিও রাখতে পারতাম, কিন্তু ব্যাপারটা কল্পনা করতে তো অসুবিধে নেই। অন্যদিকে যদি বলা হত যে চাঁদে ছ'সাতটা ইউনিকর্ণ তিনটে হয়ে যেতে পারে। তো কিছু না ভেবেই আমি বলতাম যে সেটা অসম্ভব। যে মানুষটা শিখেছে তিনের সঙ্গে এক যোগ করলে চার হয়, তাকে তো আর ওই কথাটা মুদ্রা, দাবা - পাশার খুঁটি বা পেনসিল, এসব গুণে গুণে যাচাই করে দেখতে হয় না। জিনিসটা সে জেনে গেছে, তা ফুরিয়ে গেলে। যোগ জিনিসটা তো একরকমই হবে। অনেক গণিতবিদ আছেন যাঁরা বলেন যে 'তিনি যোগ এক' বলা আর 'চার' বলা একই কথা, খালি অন্যরকমভাবে বলা...কিন্তু আমি গোটা দুনিয়ায় এক, আমি এক আলেকজান্ডার ক্রেইগি, মানবমনের মৌলিক নিয়মকানুন নস্যাৎ করা এই বস্তুগুলোর খালি আমার ভাগ্যেই ছিল।

প্রথমে এল এরকমের উদ্বেগ, পাগল হয়ে গেছি এই ভয়; তারপর মনে হল আমি যদি শুধু পাগল হতাম সেও এর চেয়ে ভালো ছিল, কারণ মহাবিশ্ব যে বহিসে সইতে পারে এ আবিষ্কারের চেয়ে নিজের মনে অলীক দৃশ্য দেখায় অশান্তি কম। যদি এমন হয় যে তিনের সঙ্গে এক যোগ করলে দুই-ও হতে পারে আর চোদ্দও হতে পারে, তাহলে যুক্তি বা পাগলামোও তাই।

ওই সময়টাতে, পাথরগুলোকে আমি প্রায়ই স্বপ্নে দেখতাম। প্রতি রাতেই যে গল্পটা আসছে না ছিটে ফোঁটা হলেও মনে একটু আশা বেঁচে ছিল, তবে সে আশা অচিরেই আতঙ্কে পরিণত হল। স্বপ্নগুলো সবই কম বেশী একই রকম; শুরুতেই একা আভাস, শেষটা ভয়ঙ্কর হবে। একটা ঘোরানো সিঁড়ি — একটা লোহার রেলিং আর কয়েকটা লোহার ধাপ— আর তারপর মাটির নীচে একটা বা এক সারি ঘর, সেগুলো আবার আরো নীচে চলে গেছে, তারপর আবার সিঁড়ি, সে সিঁড়ি হয়ত হঠাৎ করে শেষ হয়ে গেছে, কিম্বা একটা লোহালক্কড় যন্ত্রপতির কারখানায় গিয়ে পড়েছে, নয়ত অন্ধকূপ বা জলায় গিয়ে শেষ হয়েছে। আর সবচেয়ে তলায় মাটির সেই পরিচিত ফাটলগুলোতে রয়েছে সেইই পাথর, পৌরাণিক দানবপ্রতিম, ঈশ্বরের অযৌক্তিকতার মূর্তিমান প্রতীক হয়ে। তারপরই কাঁপতে কাঁপতে জেগে উঠব। ওইতো বাক্সের মধ্যে পাথরগুলো পড়ে আছে, খুললেই বাড়া - কমার খেলা শুরু করবে।

এবার আমার প্রতি গ্রামের লোকগুলোর ধরনধারণ কেমন বদলাতে লাগল। ওদের 'নীল বাঘ' -এর দৈবশক্তি আমায় ছুঁয়েচে, কিন্তু পরিত্র পাহাড়চূড়ো যে আমি অপবিত্র করেছি সেটাও তো আবার ওদের জানা। দিনে রাতে যে কোনো মুহূর্তেই দেবতারা আমায় শাস্তি দিতে পারেন। আমায় আক্রমন করা যা বা যা করেছি তার জন্য দোষারোপ করা — সে সাহস ওরা করছে না, কিন্তু দেখছি এদের প্রত্যেকে যেন বিপজ্জনক রকম জো-হুজুর হয়ে উঠেছে। পাথর নিয়ে খেলা করা বাচ্চাটার দিকে আমি কক্ষনো চোখ তুলে তাকাই না, ভয়, খাবারে বিষ দেবে কিম্বা পেছনে ছুরি বসাবে। ভোর হবার আগেই এক সকালে আমি গ্রাম তেকে চুপচাপ কেটে পড়লাম। বুঝতে পেরেছিলাম, গোটা গ্রামের লোকজনের দৃষ্টি আমার ওপর আর আমার এই পালানোটা ওদের স্বাস্তি দেবে। সেই প্রথমদিন সকাল থেকেই কেউ আমার কাছে একবারও পাথরগুলো দেখতে চায়নি।

পকেটে কয়েকটা চাকতি নিয়ে আমি লাহোরে ফিরে এলাম। আমার বইপত্রগুলোর পরিচিত জগতে ফিরে যে স্বস্তিটা পাবো ভেবেছিলাম সেটা হল না।

সেই উঁচু চাতালের দিকে ক্রমশ উঠে যাওয়া জংলা জঘন্য সেই গ্রাম, সেই জঙ্গল, কাঁটাঝোঁপ, চাতালের মধ্যেই সেই ছোটো ছোটা ফাটল, আর ফাটলের মধ্যে সেই পাথরগুলো —এই গ্রহেই তাদের অধিষ্ঠান। আজও। এইসব উল্টোপাল্টা জিনিস আমার স্বপ্নের মধ্যে সংখ্যায় বহুগণিত হয়ে তালগোল পাকাতে লাগল। গ্রামটাই হয়ে যাচ্ছে নুড়ি পাথর, জঙ্গল হয়ে যাচ্ছে জল, জল হচ্ছে জঙ্গল। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গ ছাড়লাম। ভয় হল, মানুষের বিজ্ঞানকে পাত্তা না দেওয়া ওই ভয়ঙ্কর অলৌকিকগুলো ঝোঁকের মাথায় করে ওদের দেখিয়ে ফেলি।

কয়েকটা পরীক্ষা করে দেখলাম। একটা চাকতির ওপর যোগচিহ্নের মত খোদাই করে তাকে অন্যগুলোর সঙ্গে মিশিয়ে ঘেটে দিলাম। এ রকম দু-একবার করার পর দেখি চাকতির সংখ্যা বেড়ে গেছে, আর ওটাও হাপিস। একটা চাকতির মাঝখানে ছ্যাঁদা করে পরীক্ষাটা আবার করলাম। ওটাও আর পাওয়া গেল না। পরদিন আবার ঐ যোগচিহ্ন কাটা চাকতিটা যেন শূন্য থেকে ফিরে এলো। এ কোন রহস্যময় শূন্য, যা এক দুর্বোধ্য নিয়ম বা মানবাতীত কোনো ইচ্ছাশক্তির অঙ্গুলি হেলনে নুড়িপাথর শুষে নেয়, আবার তার মধ্যে একটা দুটো ফিরিয়েও দেয়?

গণিতের মূর্তিমান ব্যত্যয়, সংখ্যায় বেড়েই চলা সেই অচেতন পাথরগুলোর মধ্যেও আমি নিয়ম খুঁজতে লাগলাম।

নিয়মশৃঙ্খলার প্রতি যে আকুতি আদিতে গণিতের সৃষ্টি করেছিল, সেই একই তাড়নায় চেষ্টা করলাম ওদের এলোমেলো বাড়াকমার মধ্যেও যদি কোনও নিয়ম বার করা যায়। দিন রাত এক করে এই পরিবর্ত্তনের খতিয়ান তৈরী করতে লাগলাম। আমার অনুসন্ধানের এই পর্যায়ের কয়েকটা নোট বই এখনও আছে, ব্যর্থ আঁকি বুঁকি বোঝাই। আমার পদ্ধতিটা ছিল এইরকম ঃ পাথরগুলোকে চোখ দিয়ে গুনে সংখ্যাটা লিখে রাখলাম। তারপর ওগুলোকে দুভাগে ভাগ করে দুটো মুঠোয় নিয়ে টেবিলের ওপর আলাদা আলাদা করে ছড়িয়ে রাখলাম। দুটোকে আলাদা ভাবে গুণে যোগফল দুটো লিখে রাখলাম। এই গোটা প্রক্রিয়াটা বার বার করে গেলাম। এই পর্যায়বৃত্তির ভেতরে এক গোপন নকসার খোঁজ, শেষ কোথাওই নিয়ে পৌঁছালো না। আমার গোনা সবচেয়ে বেশি সংখ্যা হোলো ৮১৯; আর সবচেয়ে কম সংখ্যা হোলো তিন। এমন একটা মুহূর্ত এলো যখন আমার আশা হোলো কিম্বা আশঙ্কা হোলো যে ওগুলোর হয়ত এবার সবসুদ্ধু এক সঙ্গে উধাও হয়ে যাবে। অতি অল্প পরীক্ষানিরীক্ষাতেই বুঝলাম, চাকতিগুলোর মধ্যে যে কোনও একটাকে অন্যগুলোর থেকে আলাদা করে নিলে উধাও -ও হয় না, সংখ্যাও বাড়ে না।

স্বাভাবিকভাবেই যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ এই চার রকমের গাণিতিক প্রক্রিয়া এখানে অচল। পাটিগণিতে, সম্ভাবনাতত্ত্ব, কোনো হিসেবে নিকেশেই এই পাথরগুলোর ক্ষেত্রে খাটছে না। চল্লিশটা চাকতিকে ভাগ করার পর হয়ত নটা চাকতি হল, ওই নটাকে আবার ভাগ করলে তিনশোয় গিয়ে দাঁড়াতে পারে। জানি না ওগুলোর ওজন কত হবে, কোনও কিছু দিয়ে মেপে দেখিনি, কিন্তু সবগুলোরই ওজন একই এবং হালকা, এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। ওগুলোর রং -ও সবসময়েই ওই এক নীল।

এইসব পরীক্ষাগুলো আমার পাগল হয়ে যাওয়া থেকে বাঁচতে সাহায্য করলো। গণিতের বিজ্ঞানকে নস্যাৎ করে দেওয়া ওই পাথরগুলোকে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে একাধিক বার মনে এসেছে সেই নুড়িগুলোর কথা যা দিয়ে গ্রীকরা প্রথম আঁক কষেছিল, নুড়িপাথর অনেক ভাষাতেই ক্যালকুলাম কথাটা এসেছে। নিজের মনে মনে বললাম, নুড়িপাথর থেকে গণিতের উৎপত্তি, আর ওতেই শেষ। পিথাগোরাস যদি এই পাথরগুলো নিয়ে কাজ করতেন...

প্রায় মাসখানেক পর আমি উপলব্ধি করলাম এই যোগফলের ভেতর থেকে বেরোবার কোনও উপায় নেই। বেয়াড়া চাকতিগুলো পড়ে থাকবে, ওগুলোকে ছুঁয়ে আরো একবার সেই শিরশিরানি অনুভব করার হাতছানি থাকবে, ছড়িয়ে দিয়ে বাড়াকমা আর জোড়াবিজোড় গোনাও থাকবে। ভয় ভয় ধরে গেল, ওগুলো অন্যান্য জিনিসকেও সংক্রামিত করবে— বিশেষ করে আঙুলগুলো, যেগুলো ও গুলোকে ধরবার জন্য নিশপিশ করছে। কয়েকদিন ধরে নিজের ওপর হুকুম জারি করলাম যে অনবরত ওই পাথরগুলো নিয়েই ভেবে যাব, কারণ জানতাম যে ওগুলোকে তুলতে চাইলে বড় জোর এক মুহূর্ত ভুলে থাকতে পারবো, তারপর মনে পড়লেই তো আবার সেই যন্ত্রনা — সেটা সহ্য করতে পারবো না।

১০ই ফেব্রুয়ারীর রাতটা আমি ঘুমোইনি। ভোর অব্দি হাঁটাহাঁটি করার পর, ওয়াজিল খাঁ মসজিদের দরজাগুলোর মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলাম। তখনও আলো ততটা ফোটেনি যাতে করে জিনিস পত্রের রঙ বোঝা যায়। মসজিদ চত্তরে পুরো শুনশান। জানি না কেন, মসজিদের ফোয়ারার পুণ্য ধারায় আমি আমার হাতদুটো ডোবালাম। মসজিদের ভেতর দাঁড়িয়ে মনে হল, ঈশ্বর আর আল্লা একটা একক অবোধগম্য স্বত্তার দুটো নাম মাত্র। জোরে জোরে প্রার্থনা শুরু করলাম, এ বোঝার হাত থেকে আমার মুক্তি তাও। চুপচাপ দাঁড়িয়ে কোনোও উত্ততেরর জন্য অপেক্ষা করলাম।

কোনও পায়ের শব্দ পাইনি, কিন্তু একটা কণ্ঠস্বর খুব কাছ থেকে আমায় বলল ঃ 'এই যে আমি'।

একটা ভিখিরি আমার পাশে দাঁড়িয়ে। নরম আলোয় আমি দেখতে পেলাম তার মাথার পাগড়ি, দৃষ্টিহীন চোখদুটো, ফ্যাকাসে চামড়া, ধুসর দাড়ি।

আমার দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে একইরকম নরম গলায় সে বলল ঃ 'ভিক্ষে দাও, ওগো গরিবের মা বাপ...'

পকেটে হাত ঢোকালাম আমি। বললাম, 'আমার কাছে একটা পয়সাও নেই।"

ভিখিরি বলল, 'তোমার অনেক আছে।'

পাথরগুলো আমার ডান পকেটে ছিল। একটা বের করে নিয়ে ওর কোষ করা হাতের তালুতে দিলাম। একটা ফোঁটাও শব্দ হল না।

ও বলল, 'ওগুলো সবকটাই আমায় দিতে হবে। সে সবটা দেয় না, সে কিছুই দেয় না।'

বুঝতে পারলাম, বললাম ঃ ''তোমায় একটা কথা বলতে চাই, আমার দেওয়া ভিক্ষেটা কিন্তু অভিশাপ হয়ে যেতে পারে।"

'বোধহয় একমাত্র ওই দানটাই আমি দান হিসেবে নিতে পারি। আমি যে পাপ করেছি।'

সমস্ত পাথরগুলো আমি তার অবতল হাতের তালুতে ঢেলে দিলাম। সামান্যতম কোনো শব্দ ছাড়াই ওগুলো পড়ল, এমনভাবে যেন কোন অতল সাগরে গিয়ে পড়েছে।

তারপর লোকটা আবার বলল ঃ

''আমি এখনও জানি না আমাকে দেওয়া তোমার উপহারগুলো কি, কিন্তু আমি তোমায় যেটা দেবো তাতে অবাক হয়ে যাবে। তুমি ফিরে পাবে তোমার দিন আর রাত্রি, তোমার কাণ্ডজ্ঞান, তোমার অভ্যাসগুলো, তোমার সেই জগৎটা।'

সেই অন্ধ ভিখিরির পায়ের শব্দ আমি শুনিনি, কিম্বা দেখিনি তাকে অন্তর্হিত হতেও, ভোরের সেই আলোছায়ায়।